ভারতশিল্পে মূর্তি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

বিজ্ঞপ্তি

এই প্রবন্ধ প্রথমে 'মূর্তি' নামে ১৩২০ পৌষ ও মাঘ -সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। সুকুমার রায় -কৃত ইহার ইংরেজি অনুবাদ *(Some Notes on Indian Artistic Anatomy)* কলিকাতা ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট কর্তৃক ১৯২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং শ্রীমতী আঁদ্রে কার্পেলে -কৃত ফরাসি অনুবাদ *(Art et Anatomie Hindous)* ১৯২১ সালে প্যারিস হইতে প্রকাশিত হয়। মূল বাংলা রচনাটি এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

ভূমিকা

আমার প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং তাঁহার যত্নে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আনীত শ্রীগুরুস্বামী স্থপতিকে এবং আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ বেঙ্কটাপ্পা ও শ্রীমান্ নন্দলাল বসুকে ধন্যবাদ দিয়া, মূর্তি সম্বন্ধে এই সংগ্রহটি প্রকাশ করিবার পূর্বে পাঠকবর্গকে এবং বিশেষ করিয়া নিখিল শিল্পসাগর-সংগমে আমার সহযাত্রী বন্ধু ও শিষ্যবর্গকে এই অনুরোধ যে, শিল্পশাস্ত্রের বচন ও শাস্ত্রোক্ত মূর্তিলক্ষণ ও তাহার মানপ্রমাণাদির বন্ধন অচ্ছেদ্য ও অলজ্ঘনীয় বলিয়া তাঁহারা যেন গ্রহণ না করেন, অথবা নিজের নিজের শিল্পকর্মকে চিরদিন শাস্ত্রপ্রমাণের গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া স্বাধীনতার অমৃতস্পর্শ হইতে বঞ্চিত না করেন।

উড়িতে শক্তি যত দিন না পাইয়াছি তত দিনই নীড় ও তাহার গণ্ডি। গণ্ডির ভিতরে বসিযাই গণ্ডি পার হইবার শক্তি আমাদের লাভ করিতে হয়, তার পব একদিন বাঁধ ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। এটা মনে রাখা চাই যে আগে শিল্পী ও তাহার সৃষ্টি, পরে শিল্পশাস্ত্র ও শাস্ত্রকার— শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শাস্ত্র। আগে মূর্তি রচিত হয়; পরে মূর্তিলক্ষণ, মূর্তিবিচার, মূর্তিনির্মাণের মান-পরিমাণ নির্দিষ্ট ও শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ হয়। বাঁধন, চলিতে শিখিবার পূর্বে আমাদের বিপথ হইতে ফিরাইবার জন্য, দুই পায়ে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিবার অবসর দিবার জন্য; চিরদিন ঘরের কোণে আমাদের অশক্ত অবস্থায় বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নয়। মুক্তি ধার্মিকের; আর ধর্মার্থীর জন্য ধর্মশাস্ত্রের নাগপাশ। তেমনি শিল্পশাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি

শিল্পশিক্ষার্থীর জন্য; আর শিল্পীর জন্য তাল, মান, অঙ্গুল, লাইট-শেড, পার্সপেক্টিভ আর অ্যানাটমির বন্ধনমুক্তি।

ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া কেহ যেমন ধার্মিক হয় না। তেমনি শিল্পশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া বা তাহার গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রহিয়া কেহ শিল্পী হয় না। সে কী বিষম ভ্রান্ত যে মনে করে মাপিয়া-জুখিয়া শাস্ত্রসম্মত মূর্তি প্রস্তুত করিলেই শিল্পজগতের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া শিল্পলোকের আনন্দবাজারে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়।

শ্রীক্ষেত্রের যাত্রী যখন প্রথম জগবন্ধু দর্শনে চলে তখন পাণ্ডা তাহার হাত ধরিয়া উঁচা-নীচা ডাহিনা-বাঁয়া এইরূপ বলিতে বলিতে দেবতাদর্শন করাইতে লইয়া যায়; ক্রমে যত দিন যায় পথও তত সড়গড় হইয়া আসে এবং পাণ্ডারও প্রয়োজন রহে না, পরে দেবতা যে দিন দর্শন দেন সে দিন দেউল মন্দির পূর্বদ্বার পশ্চিমদ্বার ধ্বজা চূড়া উঁচা-নীচা দেবতার পাণ্ডা ও অঙ্কশাস্ত্রের কড়া-গণ্ডা সকলই লোপ পায়।

নদী এক পাড় ভাঙে নূতন পাড় গড়িবার জন্য, শিল্পীও শিল্পশাস্ত্রের বাঁধ ভঙ্গ করেন সেই একই কারণে। এটা যে আমাদের প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রকারগণ না বুঝিতেন তাহা নয় এবং শাস্ত্রপ্রমাণের সুদৃঢ় বন্ধনে শিল্পীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিলে শিল্পও যে বাঁধা নৌকার মতো কোনোদিন কাহাকেও পরপারের আনন্দবাজারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে অগ্রসর হইবে না সেটাও যে তাঁহারা না ভাবিয়াছিলেন তাহা নয়।

পাণ্ডিত্যের টীকা হাতে করিয়া শিল্পশাস্ত্র পড়িতে বসিলে শাস্ত্রের বাঁধনগুলার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু বজ্র-আঁটুনির ভিতরে ভিতরে যে ফস্কা গেরোগুলি আচার্যগণ শিল্পের অমরত্ব কামনা করিয়া সযত্নে সংগোপনে রাখিয়া গেছেন তাহার দিকে মোটেই আমাদের চোখ পড়ে না। সেব্যসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম্ঃ এ কথার অর্থ কি

শিল্পীকে বলা নয় যে, যখন পূজার জন্য প্রতিমা গঠন করিবে কেবল তখনই শাস্ত্রের মত মানিয়া চলিবে, অন্যপ্রকার মূর্তি-গঠনকালে তোমার যথা-অভিরুচি গঠন করিতে পার। আমি এই প্রবন্ধে ত্রিভঙ্গ মূর্তির দুইটি পৃথক চিত্র দিয়াছি— একটি শাস্ত্রসম্মত মাপজোখ ঠিক রাখিয়া, অন্যটি ভারতশিল্পীরচিত শতসহস্র ত্রিভঙ্গ মূর্তি হইতে যে কোনো একটি বাছিয়া লইয়া— শাস্ত্রীয় টান আর শিল্পীর টান দুই টানে দুই ত্রিভঙ্গ কিরূপ ফুটিয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য।

সৌন্দর্যকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য যে দিন শাস্ত্রোক্ত মান-পরিমাণ দিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন সেদিন হয়তো সৌন্দর্যলক্ষ্মী কোনো এক অজ্ঞাত শিল্পীর রচিত শাস্ত্রছাড়া সৃষ্টিছাড়া মূর্তিতে ধরা দিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিয়াছিলেন : আমার দিকে চাহিয়া দেখো! আচার্য দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন ও বুঝিয়াই বলিয়াছিলেন : সেব্যসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম্— লক্ষ্মী, আমার শাস্ত্র ও প্রতিমা-লক্ষণ তোমার জন্য নয়, কিন্তু সেই-সকল মূর্তির জন্য যেগুলি লোকে পূজা করিতে মূল্য দিয়া গড়াইয়া লয়। তুমি বিচিত্রলক্ষণা! শাস্ত্র দিয়া তোমায় ধরা যায় না, মূল্য দিয়া তোমায় কেনা যায় না!

সর্বাঙ্গৈঃ সর্বরম্যো হি কশ্চিল্লক্ষে প্রজায়তে।
শাস্ত্রমানেন যো রম্যঃ স রম্যো নান্য এব হি॥
একেষামেব তদ্ রম্যং লগ্নং যত্রচ যস্য হৃৎ।
শাস্ত্রমানবিহীনং যদ্ রম্যং তদবিপশ্চিতাম্॥

পণ্ডিতে বলেন শাস্ত্রমূর্তিই সুন্দর মূর্তি, কিন্তু হায় পূর্ণ সুন্দর লাখে তো এক মিলে না। একে বলে, শাস্ত্রছাড়া সুন্দর কি? আরে বলে, সুন্দর সে যে হৃদয় টানে, প্রাণে লাগে।

তাল ও মান

আমাদের প্রাচীন শিল্পকারগণ মূর্তিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা— নর, ক্রূর, আস্থর, বালা, এবং কুমার। এই পাঁচ শ্রেণীর মূর্তি গঠনের জন্য বিভিন্ন পাঁচ প্রকার তাল ও মান নির্দিষ্ট হইযাছে, যথা—

নরমূর্তি : দশতাল

ক্রূরমূর্তি : দ্বাদশতাল

আস্থরমূর্তি : ষোড়শতাল

বালামূর্তি : পঞ্চতাল

কুমারমূর্তি : ষট্‌তাল

এক তালের পরিমাণ শিল্পকারগণ এইরূপ নির্দেশ করেন, যথা— শিল্পীর নিজমুষ্টির এক-চতুর্থাংশকে এক অঙ্গুল কহে, এইরূপ দ্বাদশ অঙ্গুলিতে এক তাল হয়।

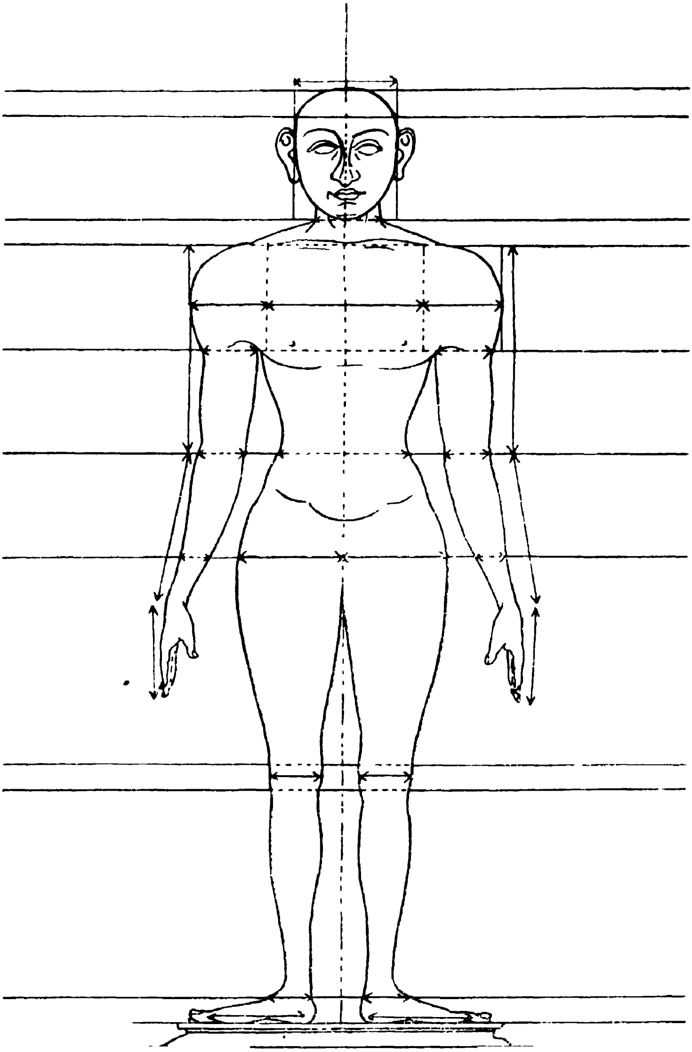
নর বা দশ তাল পরিমাণে নবনারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বাণ, বলী, ইন্দ্র, ভার্গব ও অর্জ্জুন প্রভৃতি মূর্তি গঠন করা বিধেয়।

ক্রূর বা দ্বাদশ তাল পরিমাণে চণ্ডী, ভৈরব, নরসিংহ, হযগ্রীব, বরাহ ইত্যাদি মূর্তি গঠন করা বিধেয়।

আস্থর বা ষোড়শ তাল পরিমাণে হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, নমুচি, নিশুম্ভ, শুম্ভ, মহিষাস্থর, রক্তবীজ ইত্যাদি মূর্তি গঠনীয়।

বালা বা পঞ্চ তাল পরিমাণে শিশুমূর্তি, যেমন বটকৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি। এবং—

কুমার বা ষট্‌ তাল পরিমাণে শৈশবাতিক্রান্ত অথচ অতরুণ, যেমন উমা, বামন, কৃষ্ণসখা ইত্যাদি মূর্তি গঠন করা বিধেয়।



উত্তম নবতাল

দশ, দ্বাদশ, ষোড়শ, ষট্‌, এবং পঞ্চতাল ছাড়া মূর্তিগঠনে উত্তম নবতাল পরিমাণ ভারতশিল্পীগণকে প্রায়ই ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এই উত্তম নবতাল পরিমাণ অনুসারে মূর্তির আপাদমস্তক সমান নয় ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এই এক-এক ভাগকে তাল কহে। তালের এক-চতুর্থ ভাগকে এক অংশ কহে। এইরূপ চারি অংশে এক তাল হয় এবং মূর্তির আপাদমস্তকের দৈর্ঘ্য বা খাড়াই ছত্রিশ অংশ বা নয় তাল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বমুদ্রিত চিত্রটি উত্তম নবতাল পরিমাণে অঙ্কিত।

উত্তম নবতাল পরিমাণে মূর্তির দৈর্ঘ্য বা খাড়াই, যথা— ললাটেব মধ্য হইতে চিবুকের নিম্নভাগ ১ তাল, কণ্ঠমূল হইতে বক্ষ ১ তাল, বক্ষ হইতে নাভি ১ তাল, নাভি হইতে নিতম্ব ১ তাল, নিতম্ব হইতে জানু ২ তাল, এবং জানু হইতে পদতল ২ তাল, ব্রহ্মরণ্ধ্র হইতে ললাটমধ্য ১ অংশ, কণ্ঠ ১ অংশ, জানু ১ অংশ, পদ ১ অংশ। প্রস্থ বা বিস্তার, যথা— মস্তক ১ তাল, কণ্ঠ ২॥০ অংশ, এক স্কন্ধ হইতে আর-এক স্কন্ধ ৩ তাল, বক্ষ ৬ অংশ, দেহমধ্য ৫ অংশ, নিতম্ব ২ তাল, জানু ২ অংশ, গুল্‌ফ ১ অংশ, পদ ৫ অংশ। উত্তম নবতাল পরিমাণে মূর্তির হস্তের দৈর্ঘ্য বা খাড়াই, যথা— স্কন্ধ হইতে কফোণী (কনুই) ২ তাল, কফোণী হইতে মণিবন্ধ ৬ অংশ, পাণিতল ১ তাল। প্রস্থ বা বিস্তার, যথা— কক্ষমূল ২ অংশ, কফোণী (কনুই) ১॥০ অংশ, মণিবন্ধ ১ অংশ।

মূর্তিব মুখ তিন সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা— ললাটের মধ্য হইতে চক্ষুতারকার মধ্য, চক্ষুর মধ্য হইতে নাসিকার অগ্র, নাসাগ্র হইতে চিবুক, এই তিন ভাগ।

শুক্রাচার্যের মতে নবতাল-পরিমিত মূর্তির প্রত্যঙ্গসমূহের পরিমাণ, যথা— শিখা হইতে কেশান্ত ৩ অঙ্গুলি খাড়াই, ললাট ৪ অঙ্গুলি, নাসিকা ৪ অঙ্গুলি, নাসাগ্র হইতে চিবুক ৪ অঙ্গুলি, গ্রীবা ৪ অঙ্গুলি খাড়াই।

ভ্রূর পরিমাণ লম্বা ৪ এবং চওড়া অর্ধ অঙ্গুলি, নেত্রের পরিমাণ লম্বা ৩ অঙ্গুলি, চওড়া ২ অঙ্গুলি। নেত্রতারকা নেত্রেব তিন ভাগের এক ভাগ। কর্ণের পরিমাণ— খাড়াই ৪ অঙ্গুলি, চওড়া ৩ অঙ্গুলি। কর্ণের খাড়াই এবং ভ্রূর দৈর্ঘ্য সমান হইয়া থাকে। পাণিতল দৈর্ঘ্যে ৭ অঙ্গুলি, মধ্যমাঙ্গুলির দৈর্ঘ্য ৬ এবং অঙ্গুষ্ঠের দৈর্ঘ্য ৩॥০ অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠের দৈর্ঘ্য তর্জনীর প্রথম পর্ব পর্যন্ত। অঙ্গুষ্ঠের দুইটি মাত্র পর্ব বা গাঁঠ এবং তর্জনী প্রভৃতি আর-সকল অঙ্গুলির তিন তিন গাঁঠ হইয়া থাকে। অনামিকা মধ্যমাঙ্গুলি অপেক্ষা অর্ধ পর্ব, কনিষ্ঠাঙ্গুলি অনামিকা অপেক্ষা এক পর্ব, এবং তর্জনি মধ্যমাঙ্গুলি অপেক্ষা এক পর্ব খাটো হইয়া থাকে। পদতল দৈর্ঘ্যে ১৪ অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ ২, তর্জনি ২॥০ বা ২ অঙ্গুলি, মধ্যমা ১॥০, অনামিকা ১॥০, কনিষ্ঠা ১॥০।

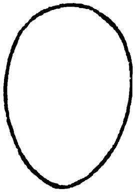
স্ত্রীমূর্তির পরিমাণ পুরুষমূর্তি অপেক্ষা প্রায় এক অংশ খাটো করিয়া গঠন করা বিধেয়।

শিশুমূর্তির পরিমাণ, যথা— কণ্ঠের অধোভাগ হইতে পদ পর্যন্ত শিশুর দেহ তাহার নিজমুখের সাড়ে চার গুণ অর্থাৎ কণ্ঠের অধোভাগ হইতে উরুমূল দুই গুণ এবং শিশুদেহের বাকি অর্ধাংশ মস্তকের আড়াই গুণ। শিশুমূর্তির বাহু তাহার মুখের বা পদতলের দুই গুণ হইয়া থাকে। এবং শিশুর গ্রীবা খাটো, মস্তক বড়ো হয় ও বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর শরীর যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় মস্তক সেরূপ বৃদ্ধি পায় না।

আকৃতি ও প্রকৃতি

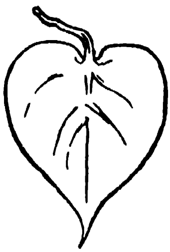
সুগঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর শরীর জগতে দুর্লভ এবং এক মানবের আকৃতি-প্রকৃতির সহিত অন্যের আকৃতি-প্রকৃতির মোটামুটি মিল থাকিলেও ডৌল হিসাবে কোনো একের দেহগঠন আদর্শ করিয়া ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। সকল মনুষ্যেরই দুই দুই হস্ত ও পদ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি এবং ঐ-সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোটামুটি গঠনও একই রূপ সত্য, কিন্তু মানবজাতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা -বিধায় নানা লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পার্থক্য আমাদের এতই চোখে পড়ে যে শিল্প হিসাবে দেহগঠনের একটা আদর্শ বাছিয়া লওয়া শিল্পীর পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়ে। কিন্তু ইতর জীব জন্তু এবং পুষ্প পল্লব ইত্যাদির জাতিগত আকৃতির সৌসাদৃশ্য আমাদের নিকট অনেকটা স্থির বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যেমন একজাতীয় পত্র-পুষ্প হয়-হস্তী ময়ূর-মৎস্যের গঠনের তারতম্য অধিক নাই। একটি অশ্বত্থপত্র অন্য পত্রগুলির মতোই সূচ্যগ্র ও ত্রিকোণাকার; এক কুক্কুটাণ্ড অন্য কুক্কুটডিম্বের মতোই সুডৌল সুগোল। এইজন্যই বোধ হয় আমাদের শিল্পাচার্যগণ মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ডৌল অমুক মানুষের হস্ত-পদাদির তুল্য না বলিয়া অমুক পুষ্প অমুক জীব অমুক বৃক্ষলতা ইত্যাদির অনুরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা— মুখম্ বর্তুলাকারম্ কুক্কুটাণ্ডাকৃতি: মুখের আকার কুক্কুটডিম্বের ন্যায় গোল। পরবর্তী চিত্রে ডিম্বাকৃতি মুখ ও পানের মতো মুখ দেখানো হইয়াছে। চলিত কথায় আমরা যাহাকে পান-পারা মুখ বলি তাহার প্রচলন নেপালে ও বঙ্গদেশে দেবদেবীর মূর্তিসকলে অধিক দৃষ্ট হয়। এখন 'মুখম্ বর্তুলা-কারম্' বলাতে বলা হইল যে মুখের প্রকৃতিই বর্তুলাকার, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ নয়। কিন্তু মুখের বা মুণ্ডের প্রকৃতিটা স্বভাবতঃ গোলাকার





হইলেও মুখের একটা আকৃতি আছে যেটা বর্তুলাকার দিয়া বোঝানো চলে না; সেইজন্যই বলা হইয়াছে 'কুক্কুটাণ্ডাকৃতি', কুক্কুট-ডিম্বের ন্যায় বর্তুল। ইহাতে এইরূপ বুঝাই-তেছে যে, মস্তকের দিক হইতে চিবুক পর্যন্ত মুখের গঠন কুক্কুটডিম্বের মতো স্থূল হইতে ক্রমশ কৃশ হইয়া আসিয়াছে এবং মুখ লম্বা ছাঁদের হউক বা গোল ছাঁদেরই হউক, এই অণ্ডাকৃতিকে ছাপাইয়া যাইতে পারে না। এই অণ্ডাকৃতিকেই টিপিয়া-টুপিয়া কুঁদিয়া-কাটিয়া নানা বয়সের



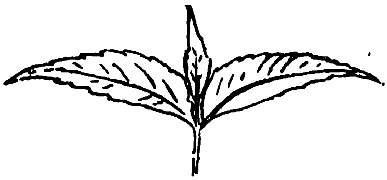


নানা মানবের মুখাকৃতির তারতম্য শিল্পীকে দেখাইতে হইবে। তাম্রঘট নানা স্থানে টোল খাইলেও যেমন ঘটাকৃতিই থাকে তেমনি নানা ছাঁদের মুখের ডৌল এই অণ্ডাকৃতির ভিতরেই নিবদ্ধ রহে। ঘটের প্রকৃতি যেমন ঘটাকার, মুণ্ডের প্রকৃতিও তেমনি অণ্ডাকার। পানের মতো মুখ, পাঁচের মতো মুখ, এমন কি প্যাঁচার মতো যে মুখ তাহাও এই অণ্ডাকারেরই ইতরবিশেষ।

ললাট, যথা—ললাটম্ ধনুষাকারম্। কেশান্ত হইতে ভ্রূ পর্যন্ত ললাট, এবং ইহা ঈষৎ-আকৃষ্ট ধনুকের ন্যায় অর্ধচন্দ্রাকার।



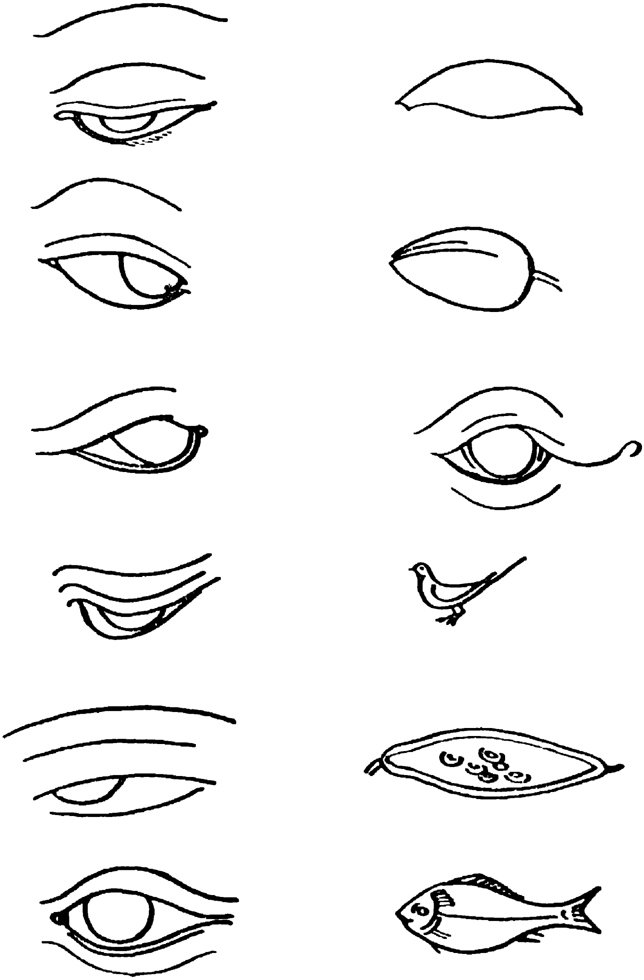
ভ্রূযুগ— নিম্বপত্রাকৃতিঃ ধনুষাকৃতির্বা। ভ্রূযুগের দুই প্রকার গঠনই প্রশস্ত, নিম্ব-পত্রাকার ও ধনুকাকার। নিম্বপত্রের ন্যায় ভ্রূ প্রায়শঃ পুরুষমূর্তিতে এবং ধনুকের ন্যায় ভ্রূ প্রায়শঃ স্ত্রীমূর্তিসকলে ব্যবহৃত হয়। এবং হর্ষ ভয় ক্রোধ প্রভৃতি নানা ভাবাবেশে ভ্রূযুগ ধনুকের ন্যায় বা বায়ুচালিত নিম্বপত্রের ন্যায় উন্নমিত, অবনমিত, আকুঞ্চিত ইত্যাদি নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয়।





নেত্র বা নয়ন— মৎস্যাকৃতি। নয়নের ভাব ও ভাষা যেমন বিচিত্র তেমনি নয়নের উপমারও অন্ত নাই। সেইজন্য সফরী বা পুঁটিমাছের সহিত তুলনা দিয়া ক্ষান্ত হইলে ডাগর চোখ, ভাসা চোখ, ইত্যাদি অনেক চোখই বাদ পড়ে। সুতরাং কালে কালে নয়নের আকৃতি প্রকৃতি বর্ণন করিয়া নানা উপমার সৃষ্টি হইয়াছে, যথা— খঞ্জন-নয়ন, হরিণ-নয়ন, কমল-নয়ন, পদ্মপলাশ-নয়ন ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে খঞ্জন ও হরিণ -নয়ন প্রায়শঃ চিত্রিত নারীমূর্তিতে ও কমল-নয়ন পদ্মপলাশ-নয়ন এবং সফরীর ন্যায় নয়ন পাষাণ ও ধাতু -মূর্তিসকলে কি দেব কি দেবী উভয়ের মূর্তি -গঠনেই ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া বাংলায় যাহাকে বলে পটল-চেরা চোখ তাহার উল্লেখ শিল্পশাস্ত্রে কিম্বা প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু অজন্তা গুহায় চিত্রিত বহু নারীমূর্তিতে পটল-চেরা চোখের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

নারী-নয়নের প্রকৃতিই চঞ্চল। তাই মনে হয় যে, শিল্পাচার্যগণ সফরী খঞ্জন এবং হরিণ এই তিন চঞ্চল প্রাণীর সহিত উপমা দিয়া নারী-নয়নের কেবল প্রকৃতিটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। খঞ্জন হরিণ কমল পদ্মপলাশ সফরী ইত্যাদি উপমা বিভিন্ন নয়নের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নয়নের নানা ভাব ও আকৃতিটাও আমাদের বুঝাইয়া দেয়। খঞ্জন-নয়নের সকৌতুক বিলাস আর সফরী-নয়নের অস্থির দৃষ্টিপাতে এবং হরিণ-নয়নের সরল মাধুরীতে, পদ্মপলাশ-নয়নের প্রশান্ত দৃক্‌পাতে এবং কমল-নয়নের আমীলিত ঢলঢল ভাবে যেমন প্রকৃতিগত প্রভেদ তেমনি আকৃতিগত পার্থক্যও আছে এবং আকৃতির পার্থক্য নয়নের পৃথক পৃথক ভাব -প্রকাশের সহায়তা করে বলিয়াই মূর্তিগঠনে চিত্ররচনায় ভিন্ন ভিন্ন আকারের নয়নের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।







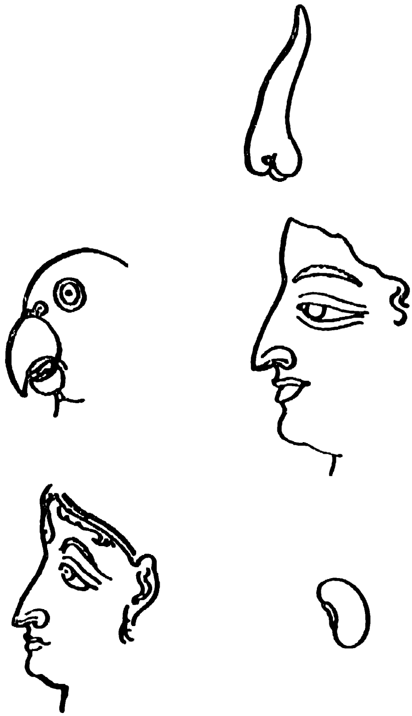
শ্রবণ বা কর্ণ —গ্রন্থলকারবৎ। কর্ণের আকৃতি ল-কারের ন্যায় করিয়া গঠন করিবে। যদিও ল-কারের সহিত কর্ণের সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু তথাপি মনে হয় কর্ণের গঠনটা ভালো করিয়া বুঝাইতে শিল্পাচার্যগণ অধিক মনোযোগী হন নাই। ইহার একমাত্র কারণ





এই মনে হয় যে, দেবীমূর্তির কর্ণ কুণ্ডলাদি নানা অলংকারে ও দেবমূর্তির কর্ণ মুকুটাদির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত বলিয়া কর্ণের আভাসমাত্র দিয়াই শিল্পাচার্যগণ ক্ষান্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশে গৃধিনীর সহিত কর্ণের তুলনা সুপ্রচলিত; কর্ণের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি গৃধিনীর চিত্র দিয়া যেমন স্পষ্ট বোঝানো যায় এমন ল-কার দিয়া নয়।

নাসা ও নাসাপুট—
তিলপুষ্পাকৃতির্নাসাপুটম্ নিষ্পাববীজবৎ। নাসিকা তিলপুষ্পের ন্যায় এবং নাসাপুট দুইটি নিষ্পাব-বীজ অর্থাৎ বরবটীর বীজের ন্যায় গঠন করিবে।



তিলপুষ্পের ন্যায় নাসা সচরাচর দেবী-মূর্তিতে ও নারীগণের চিত্র-রচনায় প্রয়োগ করা হয়। এইরূপ গঠনে নাসা ভ্রূমধ্য হইতে নিটোলভাবে লম্বমান রহে এবং দুই নাসাপুট কুসুমদলের মতো কিঞ্চিৎ স্ফুরিত দেখা যায়। শুকচঞ্চুনাসা প্রধানতঃ দেবতা ও পুরুষ-মূর্তিতে দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ গঠনে ভ্রূমধ্য হইতে নাসা ক্রমোন্নত হইয়া নাসাগ্রের দিকে গড়াইয়া পড়ে এবং নাসাগ্র সূক্ষ্ম ও দুই নাসাপুট দুই নেত্রকোণের দিকে উন্নত বা টানা দেখা যায়। শক্তিমান ও মহাত্মা পুরুষের নাসা মাত্রেই শুকচঞ্চুর আকারে গঠিত করা বিধেয়। স্ত্রীমূর্তিতে শুকচঞ্চু-নাসা একমাত্র শক্তিমূর্তিসকলেই দৃষ্ট হয়।

ওষ্ঠাধর— অধরম্ বিম্বফলম্। অধরের প্রকৃতি সরস ও রক্তবর্ণ, সেইজন্য বিম্ব (তেলাকুচা) ফলের তুলনা আকৃতিটা যত না হউক প্রকৃতিটা, অধরের মসৃণতা সরসতা ইত্যাদি বুঝাইবার সহায়তা

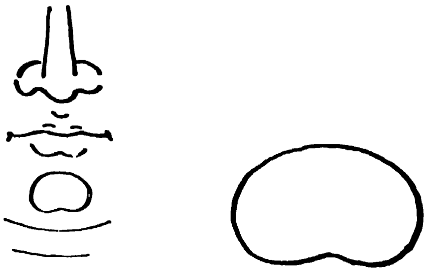


করে এবং বন্ধুজীব বা বান্ধুলী ফুল (হল্‌দিবসন্ত, গল্‌ঘোষের ফুল) অধর এবং ওষ্ঠ দুয়েরই আকৃতিটা সুন্দররূপে ব্যক্ত করে।

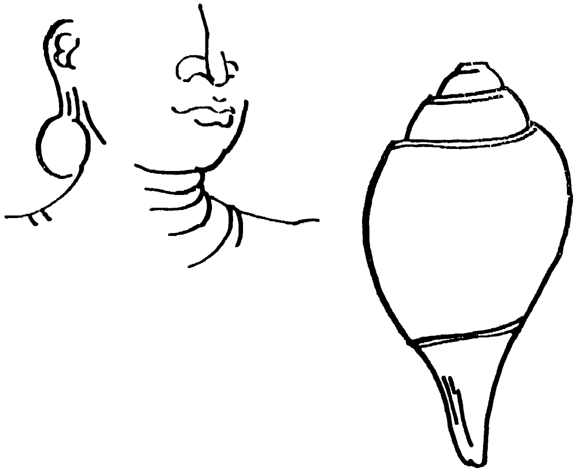


চিবুক— চিবুকম্ আম্রবীজম্। কেবল গঠনসাদৃশ্যের জন্যই যে আম্রবীজ বা আমের কষির সহিত চিবুকের তুলনা দেওয়া হইয়াছে তাহা নয়। মুখের আর-সকল অংশ অপেক্ষা তুলনায় চিবুকের প্রকৃতি

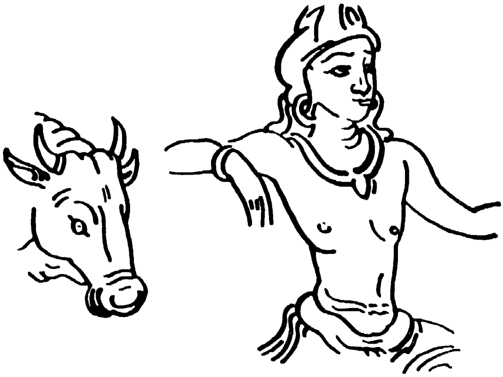
জড়, অর্থাৎ, ভ্রূ নাসাপুট নেত্র এবং ওষ্ঠাধর নানা ভাব -বশে যেমন সজীব হইয়া উঠে চিবুক সেরূপ হয় না ; সেইজন্য জড়পদার্থের সহিত চিবুকের



তুলনা দেওয়া হইয়াছে, এবং নাসা নেত্র ও ওষ্ঠাধরের তুলনা পুষ্প পত্র মৎস্য ইত্যাদি সজীব বস্তুর সহিত দেওয়া হইয়াছে। মুখের মধ্যে কর্ণও জড়, সুতরাং তাহার উপমা লকারের সহিত দেওয়া সুসংগত।



কণ্ঠ— কণ্ঠম্ শঙ্খসমাযুতম্। ত্রিবলীচিহ্নিত শঙ্খের ঊর্ধ্ব-ভাগের সহিত মানবকণ্ঠের সুন্দর সৌসাদৃশ্য আছে ; ইহা ছাড়া শব্দের স্থান যখন কণ্ঠ তখন শঙ্খের সহিত তাহার আকৃতি-প্রকৃতির তুলনা সুসংগত।



শরীর বা কাণ্ড— গোমুখাকারম্। কণ্ঠের নিম্নভাগ হইতে জঠরের নিম্নভাগ পর্যন্ত দেহাংশ গোমুখের ন্যায় করিয়া গঠন করিবে ; ইহাতে



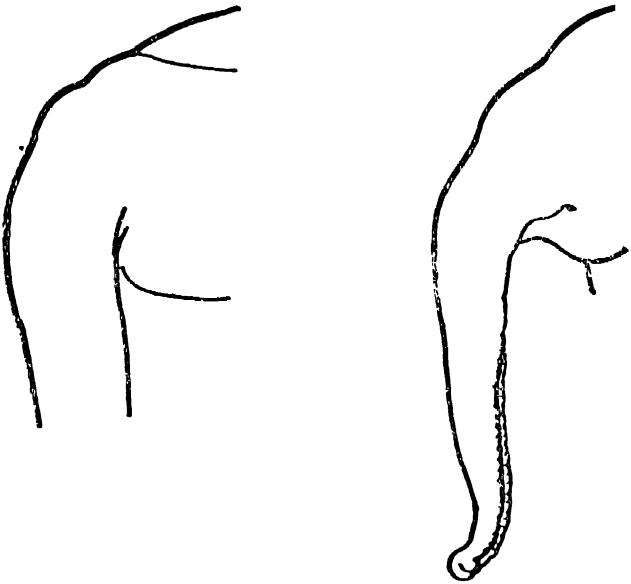
বক্ষঃস্থলের দৃঢ়তা, কটিদেশের কৃশতা ও জঠরের লোল বিলম্বিত ভাব ও গঠন সুন্দর সূচিত হয়।

শরীরের মধ্যভাগের সহিত ডমরুর ও সিংহের মধ্যভাগের তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে।



এবং দৃঢ়তা বুঝাইবার জন্য রুদ্ধ কবাটের সহিত পুরুষের বক্ষের তুলনা দেওয়া হয়, কিন্তু শরীরের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ই গোমুখ দিয়া যেমন সুচারুরূপে বুঝানো যায় সেরূপ অন্য কিছু দিয়া নয়।





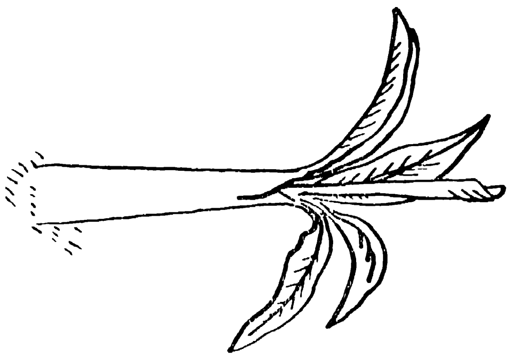
স্কন্ধ— গজতুণ্ডাকৃতিঃ। বাহু— করিকরাকৃতিঃ। গজস্কন্ধ আমাদের নিকট উপহাসের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গজমুণ্ডের সহিত মানবস্কন্ধের সৌসাদৃশ্যটা অস্বীকার করা চলে না। বাহু এবং স্কন্ধ শিল্পীরা শুণ্ড-সমেত গজমুণ্ডের মতো করিয়া চিরদিন গড়িয়া আসিতেছেন। কবি কালিদাস মানবস্কন্ধের উপমা বৃষস্কন্ধের সহিত দিয়াছেন সত্য, কিন্তু গজমুণ্ড যে বৃষস্কন্ধ অপেক্ষা আকৃতি প্রকৃতিতে মানবস্কন্ধের সমতুল্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

করিশুণ্ডের সহিত বাহুর যে কেবল আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে তাহা নয়, দুয়েরই প্রকৃতিতে একটা মিল বেশ অনুভব করা যায়। পঞ্চশীর্ষ সর্প এবং লতার সহিত কবিগণ যে বাহুর উপমা দেন তাহাতে বাহুর প্রকৃতি যে জড়াইয়া ধরা, বন্ধন করা, সেইটুকু মাত্র প্রকাশ পায় ও স্ত্রীলোকের

বাহু ও তাহার উপমাদ্বয়ের স্বধর্ম যে নির্ভরশীলতা তাহাই সূচনা করে, কিন্তু করীকরের সহিত তুলনা দিলে বাহুর প্রকৃতি আক্ষেপ বিক্ষেপ বেষ্টন বন্ধন ইত্যাদি ও সঙ্গে সঙ্গে বাহুর আকৃতিটাও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।



প্রকোষ্ঠ— বালকদলীকাণ্ডম্। কফোণী (কনুই) হইতে পাণিতলের আবন্ধ পর্যন্ত ছোট কলাগাছের ন্যায় করিয়া গঠন করিবে। ইহাতে



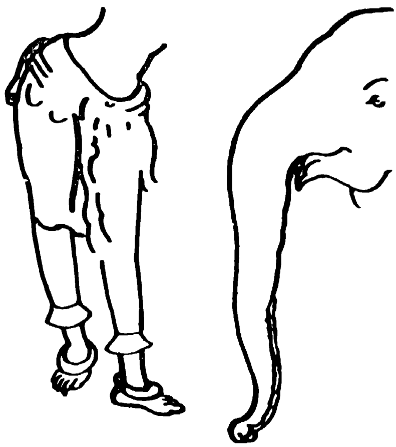
প্রকোষ্ঠের সুগঠন এবং নিটোল অথচ সুদৃঢ় ভাব দুয়েরই দিকে শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।



অঙ্গুলি— শিম্বীফলম্। শিম্ ও মটরশুঁটির সহিত অঙ্গুলির তুলনা কবিসমাজে আদর লাভ না করিলেও অঙ্গুলির গঠনের পক্ষে চাঁপার কলি অপেক্ষা শিম্বীফল অধিক প্রয়োজনে আসিয়া থাকে।

উরু— কদলীকাণ্ডম্। কলাগাছের ন্যায় উরু, কি স্ত্রীমূর্তি কি পুরুষমূর্তি উভয়েতেই শিল্পীরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া করভোরু অর্থাৎ করীশিশুর শুণ্ডের ন্যায় উরু বহু দেবী-মূর্তিতে দেখা যায়, কিন্তু উরুযুগলের দৃঢ়তা ও নিটোল গঠনের সাদৃশ্য কদলী-কাণ্ডেই সমধিক পরি-স্ফুট। বাহুদ্বয় করী-শুণ্ডের মতো নানা দিকে কার্যবশে প্রক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সেই কারণেই কদলীকাণ্ড অপেক্ষা কোমল ও দোদুল্যমান করীশুণ্ডের সহিত বাহুর তুলনা



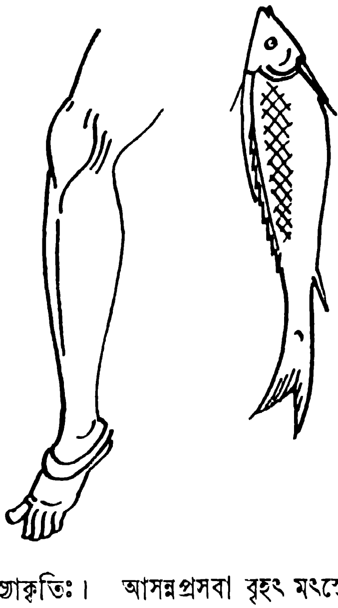


দেওয়া আকৃতি প্রকৃতি উভয় হিসাবে সুসঙ্গত হয়। উরুযুগল শরীরের সমস্ত ভার বহন করে বলিয়াই তাহার আকৃতি প্রকৃতি উভয় দিকটাই বুঝাইতে

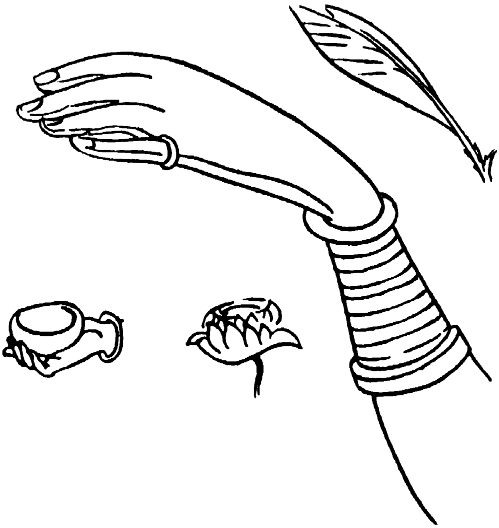
হইলে শুণ্ড অপেক্ষা কঠিনতর যে কদলীকাণ্ড তাহারই উপমা সুসঙ্গত।



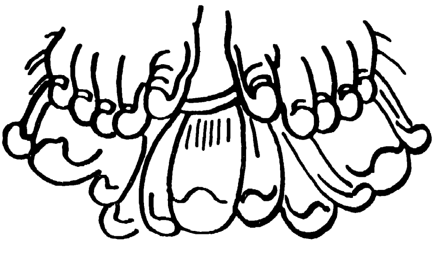
জানু— কর্কটাকৃতিঃ। কর্কটের পৃষ্ঠের সহিত জানুর অস্থিটির তুলনা দেওয়া হয়।

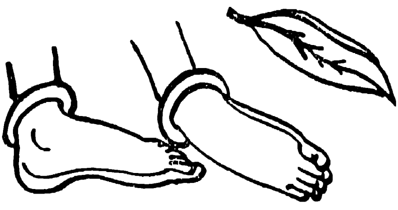


জঙ্ঘা— মৎস্যাকৃতিঃ। আসন্নপ্রসবা বৃহৎ মৎস্যের আকৃতির সহিত মানবজঙ্ঘার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

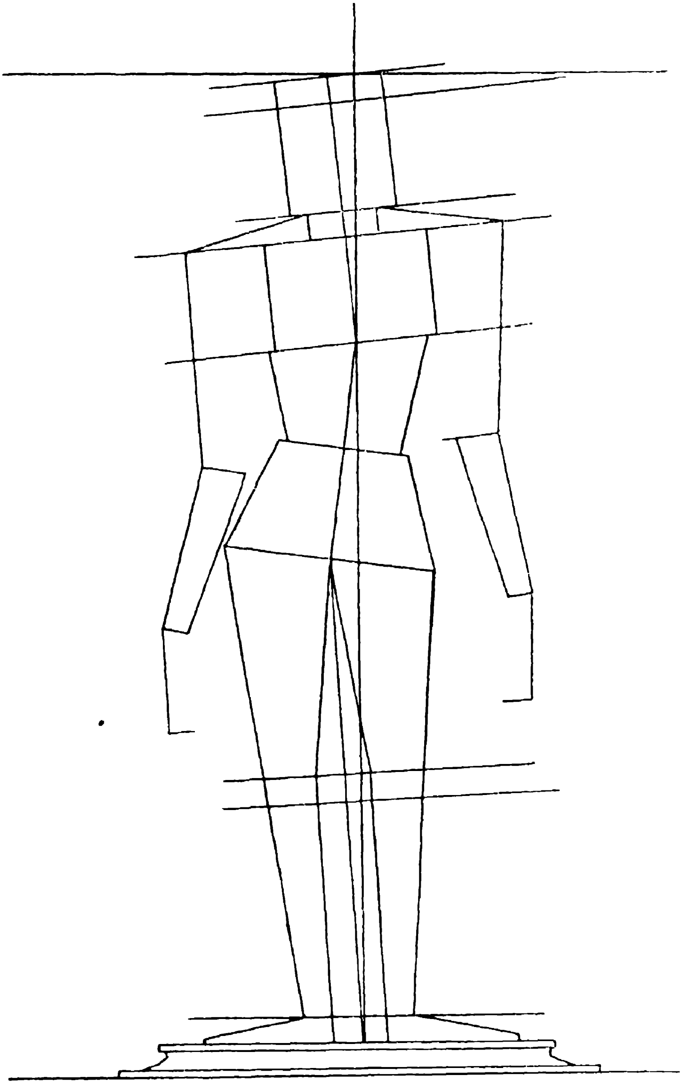


কর ও পদ— করপল্লবম্ পদপল্লবম্। কমলের সহিত ও পল্লবের





সহিত কর ও পদের আকৃতি ও প্রকৃতি-গত সৌসাদৃশ্য অজন্তা চিত্রাবলীতে ও ভারতীয় মূর্তিগুলিতে যেমন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই এমন আর কোনো দেশের কোনো মূর্তিতে নয়।



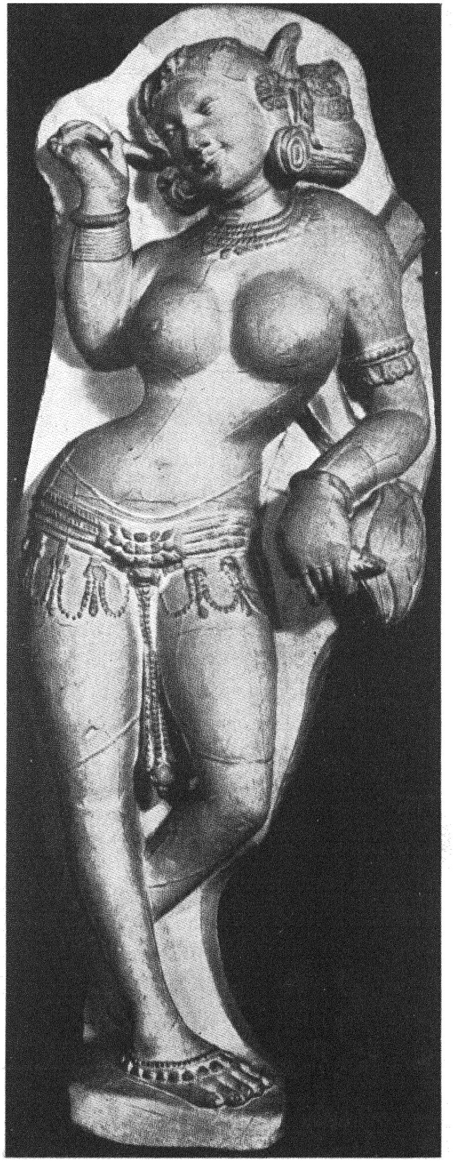
ত্রিভঙ্গ



সমভঙ্গ



আভঙ্গ



ত্রিভঙ্গ



অতিভঙ্গ

ভাব ও ভঙ্গি

ভারতীয় মূর্তিগুলিতে সচরাচর চারি প্রকারের ভঙ্গি বা ভঙ্গ দৃষ্ট হয়, যথা— সমভঙ্গ বা সমপাদ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গ।

সমভঙ্গ বা সমপাদ। এইরূপ মূর্তিতে মানসূত্র দেহকে বাম ও দক্ষিণ দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া মূর্তির শিরোদেশ হইতে নাভি, নাভি হইতে পাদমূল পর্যন্ত সরলভাবে লম্বিত হয় অর্থাৎ মূর্তিটি দুই পায়ের উপরে সোজাভাবে দেহ ও মস্তক বামে বা দক্ষিণে কিঞ্চিৎ-মাত্র না হেলাইয়া দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট রহে। বুদ্ধ, সূর্য এবং বিষ্ণুমূর্তির অধিকাংশ সমভঙ্গ ঠামে সমপাদ সূত্রনিপাতে গঠিত হয়। সমভঙ্গ মূর্তিতে দেহের বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বের ভঙ্গি বা ভঙ্গ সমান রহে, কেবল হস্তের মুদ্রা পৃথক হয়।

আভঙ্গ। এইরূপ মূর্তিতে মানসূত্র ব্রহ্মরণ্ধ্র হইতে নাসার ও নাভির বাম কিম্বা দক্ষিণ পার্শ্ব বহিয়া বাম কিম্বা দক্ষিণ পাদমূলে আসিয়া নিপতিত হয়, অর্থাৎ মূর্তির উর্দ্ধদেহ মূর্তিরচয়িতার বামে (মূর্তির নিজের দক্ষিণে), কিম্বা মূর্তিরচয়িতার দক্ষিণে (মূর্তির নিজের বামে), হেলিয়া রহে। বোধিসত্ত্ব ও অধিকাংশ সাধুপুরুষগণের মূর্তি আভঙ্গ ঠামে গঠিত হইয়া থাকে। আভঙ্গ ঠামে মূর্তির কটিদেশ মানসূত্র হইতে এক অংশ মাত্র বামে বা দক্ষিণে সরিয়া পড়ে।

ত্রিভঙ্গ। এইরূপ মূর্তিতে মানসূত্র বাম অথবা দক্ষিণ চক্ষুতারকার মধ্যভাগ, বক্ষস্থলের মধ্যভাগ, নাভির বাম অথবা দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া পাদমূলে আসিয়া নিপতিত হয়, অর্থাৎ মূর্তিটি মৃণালদণ্ডের মতো বা অগ্নিশিখার মতো পদতল হইতে কটিদেশ পর্যন্ত নিজের দক্ষিণে (শিল্পীর বামে), কটি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত নিজের বামে, এবং কণ্ঠ হইতে

শিরোদেশ পর্যন্ত নিজের দক্ষিণে হেলিয়া দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাকে। এই ত্রিভঙ্গ ঠামে রচিত দেবীমূর্তিগুলির মস্তক মূর্তির দক্ষিণে (শিল্পীর বামে) ও দেবমূর্তিগুলির মস্তক নিজের বামে (শিল্পীর দক্ষিণে) হেলিয়া থাকে, অর্থাৎ দেবতা দেবীর দিকে, দেবী দেবতার দিকে ঝুঁকিয়া রহেন। অতএব ত্রিভঙ্গ ঠামে পুরুষমূর্তিকে নিজের বামে (শিল্পীর দক্ষিণে) ও স্ত্রীমূর্তিকে নিজের দক্ষিণে (শিল্পীর বামে) হেলাইয়া গঠন করা বিধেয়, যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ দুইটি ত্রিভঙ্গ মূর্তি পাশাপাশি রাখিলে বোধ হইবে যেন মৃণালদণ্ডের উপরে প্রফুল্ল পদ্মের মতো উভয়ের মুখ উভয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইহাই হইল যুগলমূর্তির বা দেবদম্পতির গঠনরীতি। মূর্তিতে অভিমান খেদ ইত্যাদি ভাব দেখাইতে হইলে পুরুষে নারী-ত্রিভঙ্গ এবং নারীতে পুরুষ-ত্রিভঙ্গ রচনা প্রয়োগ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের বিপরীত মুখে হেলিয়া রহিবে। বিষ্ণু, সূর্য প্রভৃতি যে-সকল মূর্তি দুই পার্শ্ব-দেবতা বা শক্তির সহিত গঠন করা হয়, তাহাতে সমভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ দুই প্রকারের ভঙ্গ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা সমভঙ্গ ঠামে কোনো এক পার্শ্ব-দেবতার দিকে কিঞ্চিৎ-মাত্র না হেলিয়া একেবারে সোজাভাবে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট রহেন, আর তাঁহার দুই পার্শ্বে যে দুই দেবতা বা শক্তি— যিনি দক্ষিণে আছেন তিনি, যিনি বামে আছেন তিনিও— ত্রিভঙ্গ ঠামে উভয়েই প্রধান দেবতার দিকে নিজের নিজের মাথা হেলাইয়া দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাকেন। ইহাতে দুই পার্শ্বমূর্তি দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ত্রিভঙ্গঠামে রচনা করিতে হয়, যথা— শিল্পীর বামে ও প্রধান মূর্তির দক্ষিণ পার্শ্বে যিনি তাঁহার মস্তক শিল্পীর দক্ষিণ দিকে ও নিজের বাম দিকে, এবং শিল্পীর দক্ষিণে ও প্রধান মূর্তির বামে যিনি তাঁহার মস্তক শিল্পীর বাম দিকে ও নিজের দক্ষিণ দিকে হেলিয়া রহে। দুই

পার্শ্বদেবতা এই দুই বিপরীত ত্রিভঙ্গ ঠামে রচনা না করিলে সম্পূর্ণ মূর্তির সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে এবং দুই পার্শ্বদেবতার একটি প্রধান দেবতা হইতে বিপরীতমুখী হইয়া অবস্থান করেন। ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে মধ্যসূত্র বা মানসূত্র হইতে মস্তক এক অংশ ও কটিদেশ এক অংশ বামে বা দক্ষিণে সরিয়া পড়ে।

অতিভঙ্গ। এইরূপ মূর্তিতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিই অধিকতর বঙ্কিমতা দিয়া রচিত হয় এবং ঝড়ে যেরূপ গাছ তেমনি মূর্তির কটিদেশ হইতে উর্দ্ধদেহ কিম্বা কটি হইতে পদতল পর্যন্ত অংশ বামে দক্ষিণে পশ্চাতে অথবা সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত হয়। অতিভঙ্গ ঠাম শিবতাণ্ডব, দেবাসুরযুদ্ধ প্রভৃতি মূর্তিতেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মূর্তিতে গতিবেগ নর্তনশক্তিপ্রযোগ ইত্যাদি দেখাইতে হইলে অতিভঙ্গ ঠামে গঠন করা বিধেয়।

শুক্রনীতিসার বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে মূর্তির মান পরিমাণ আকৃতি প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেওয়া আছে। মূর্তিনির্মাণ সম্বন্ধে শিল্পচার্যগণের কয়েকটি উপদেশ প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত করা গেল, যথা—

সেব্যসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণম্ স্মৃতম্।

মূর্তি ও প্রতিমার যে-সকল লক্ষণ মান পরিমাণ ইত্যাদি দেওয়া হইল তাহা যে-সকল প্রতিমার সহিত শিল্পীর পূজকের বা প্রতিষ্ঠাতার সেব্য ও সেবক, প্রভু ও দাস, অর্চিত ও অর্চক সম্বন্ধ কেবল তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট এবং কেবল সেইরূপ মূর্তিই যথাশাস্ত্র সর্বলক্ষণসম্পন্ন করিয়া গঠন করিতে হয়। অন্য-সকল মূর্তি, যাহার পূজা কেহ করিবে না, তাহাদের শিল্পী যথা-অভিরুচি গঠন করিতে পারে।

লেখ্যা লেপ্যা সৈকতী চ মৃণ্ময়ী পৈষ্টিকী তথা
এতেষাং লক্ষণাভাবে ন কৈশ্চিদ্দোষ ঈরিতঃ॥

কিন্তু, চিত্র এবং আল্পনা, বালি মাটি ও পিটুলি দ্বারা রচিত মূর্তি বা প্রতিমা, লক্ষণহীন হইলেও দোষের হয় না; অর্থাৎ, এগুলি যথাশাস্ত্র গঠন করিতেও পার, নাও করিতে পার। কারণ এই-সকল প্রতিমা ক্ষণকালের জন্য নির্মিত হয় এবং নদীতে সেগুলিকে বিসর্জন দেওয়া হইয়া থাকে। এইপ্রকার মূর্তি সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা নিজের হাতে রচনা করিয়া থাকেন—পূজা আমোদ-প্রমোদ অথবা সময়ে সময়ে শিশুসন্তানগণের ক্রীড়ার জন্য। সুতরাং সেগুলি যে যথাশাস্ত্র সর্বলক্ষণযুক্ত হইয়া গঠিত হইবে না, তাহা ধরা কথা। এইজন্যই চিত্র আলিম্পন ইত্যাদি -রচনাতে রচয়িতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন।

তিষ্ঠন্তীং সুখোপবিষ্টাং বা স্বাসনে বাহনস্থিতাম্
প্রতিমামিষ্টদেবস্য কারয়েদ্ যুক্তলক্ষণাম্।
হীনশ্মশ্রুনিমেষাং চ সদা ষোড়শবার্ষিকীম্
দিব্যাভরণবস্ত্রাঢ্যাং দিব্যবর্ণক্রিয়াং সদা
বস্ত্রৈরাপাদগূঢ়াং চ দিব্যালঙ্কারভূষিতাম্॥

নিজ নিজ আসনে দণ্ডায়মান অথবা সুখে উপবিষ্ট কিম্বা বাহনাদির উপরে স্থিত, শ্মশ্রুহীন, নির্নিমেষদৃষ্টি, সদা ষোড়শবর্ষবয়স্ক, দিব্য আভরণ ও বস্ত্র -পরিহিত, দিব্যবর্ণ, দিব্যকার্যরত অর্থাৎ বরাভয় ইত্যাদি -দানরত এবং কটিদেশ হইতে পাদমূল পর্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত ও নূপুর মেখলা ইত্যাদি -ভূষিত করিয়া ইষ্টদেবমূর্তি গঠন করা বিধেয়।

কৃশা দুর্ভিক্ষদা নিত্যং স্থূলা রোগপ্রদা সদা।
গূঢ়সন্ধ্যস্থিধমনী সর্বদা সৌখ্যবর্ধিনী।'

প্রতিমার হস্তপদাদি কৃশ করিয়া গঠন করিলে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে, অতি স্থূল করিয়া গঠন করিলে রোগ আনয়ন করে এবং অপ্রকাশিত-অস্থি শিরা সুঠাম-হস্তপদাদি-যুক্ত মূর্তি সুখ সৌভাগ্য আনয়ন করে।

মুখানাং যত্র বাহুল্যং তত্র পংক্ত্যো নিবেশনম্।

তৎ পৃথক্ গ্রীবামুকুটং স্বমুখং সাক্ষিকর্ণযুক্।

যে মূর্তিতে তিন বা ততোধিক মুখ রচনা করিতে হয় তাহাতে মুণ্ডগুলি এক শ্রেণীর উপরে আর-এক শ্রেণী করিয়া সাজাইয়া সকল মুখেরই পৃথক গ্রীবা কর্ণ নাসা চক্ষু ইত্যাদি দিয়া গঠন করা বিধেয়। যথা, পঞ্চমুখ মূর্তিতে সারি সারি পাঁচটি মুখ এক শ্রেণীতে না সাজাইয়া চারি দিকে চার ও উপরে এক—ষড়্মুখ মূর্তিতে প্রথম থাকে চার, দ্বিতীয় থাকে দুই— দশমুখ মূর্তিতে প্রথম চার, তদুপরি তিন, তদুপরি দুই ও সর্বোপরি এক— এইরূপভাবে সাজাইতে হইবে এবং সকল মুণ্ডগুলির পৃথক পৃথক গ্রীবা মুকুট চক্ষু কর্ণাদি থাকিবে।

ভুজানাং যত্র বাহুল্যং ন তত্র স্কন্ধভেদনম্।

মূর্তিতে চার বা ততোধিক বাহু রচনা করিবার সময় এক এক বাহুর এক এক স্কন্ধ দিতে হইবে না, কিন্তু একই স্কন্ধ হইতে বাহুগুলি ময়ূরপিচ্ছের মতো ছত্রাকারে রচনা করিতে হইবে।

কচিৎ বালসদৃশং সদৈব তরুণং বপুঃ।

মূর্তীনাং কল্পয়েচ্ছিল্পী ন বৃদ্ধসদৃশং কচিৎ॥

ইষ্টদেবতার মূর্তি সর্বদা তরুণবয়স্কের ন্যায়, কখনো কখনো বালকের ন্যায় করিয়াও গঠন করিবে, কিন্তু কদাচিৎ বৃদ্ধের ন্যায় করিয়া গঠন করিবে না।

চিত্রপরিচয়

—

সমভঙ্গ। বিষ্ণু
ব্রোঞ্জ। সাহেবগঞ্জ : রংপুর
ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম। কলিকাতা

আভঙ্গ। সুন্দরমূর্তি স্বামী
ব্রোঞ্জ। সিংহল
কলম্বো মিউজিয়ম

ত্রিভঙ্গ*। অশোকদোহদ
প্রস্তর। উড়িষ্যা
লণ্ডনের 'ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়ম্'এ
রক্ষিত ছাঁচ-ঢালাই হইতে

অতিভঙ্গ। ত্রৈলোক্যবিজয়
ব্রোঞ্জ। যোগ্যকর্তা : যবদ্বীপ
জাকর্তা মিউজিয়ম

* ৩ পৃষ্ঠার উল্লেখ-মতো 'শাস্ত্রসম্মত মাপজোখ ঠিক রাখিয়া' ত্রিভঙ্গ মূর্তির একটি ছক ২৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে।